

শুদ্ধাচারের সন্ধানে

ড. মিল্টন বিশ্বাস

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইন-কানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তার বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; তার জন্য সামগ্রিক এবং নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। চরিত্রনিষ্ঠা আনয়নের জন্য মানুষের জীবনের একেবারে গোড়া থেকে, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক অপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।' স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরো কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) শেখ হাসিনা সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলনে সবাইকে অংশীদার করতে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন গত মহাজোট সরকারের সময় প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'সম্ভ্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০', 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১', 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও

দমন আইন, ২০১২', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২', 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২' ইত্যাদি। এসব আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান ব্রিটিশ আমল থেকেই চালু রয়েছে। ১৮৬০ সালের Penal Code-এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান আছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাস হয়। ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে 'দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য



প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান' প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যেসব কার্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় তা হলো: '(ক) The Prevention of Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ: (L) The Penal Code 1860 (Act XLV of 1860)-এর sections 161-169, 217, 218, 408, 409 and 477A-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ; এবং এসব অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত সহায়তাকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অপরাধকার্য। পূর্বে উল্লিখিত 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত।

কিন্তু দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এজন্য সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস দরকার।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'কৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা ঘাতে না ঘাটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে। আগামী এক দশকে এ দেশে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা' হবে, 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' হবে। এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকরা চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। দুর্নীতি প্রতিরোধে মানুষকে নৈতিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সত্যতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ যেন সে অনুসরণ করে চলে। তার যেন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য থাকে। দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যক্তি-পর্যায়ে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যতা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা খুব দরকার। এজন্য বিন্যস্ত আইনকানুন, নিয়মনীতির সঙ্গে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করতে হবে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রচেষ্টা গুরুত্ববহ।

● লেখক: অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
email-writermiltonbiswas@gmail.com